চা বাগানে শিক্ষার অধিকার আদায়ে ৫ দফা দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হোন

চা বাগান শিক্ষা অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ

শুরুর কথা

এদেশে শিক্ষার দাবিতে ছাত্র আন্দোলনের একটা দীর্ঘ অতীত আছে। বৃট্রিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত জনগনের শিক্ষার আকাঙ্খাকে ধারণ করে ছাত্র সমাজ বারে বারে বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত করেছে রাজপথ। বহু আত্মত্যাগ আর লড়াইয়ের বিনিময়ে স্বীকৃতি পেয়েছে সর্বজনীন শিক্ষার ধারণা। সাধারণ ভাবে সর্বজনীন শিক্ষার কথা প্রতিষ্ঠিত হলেও গোটা চা অঞ্চলে আজ পর্যন্ত তা কার্যকর হয় নি। শিক্ষার অভাবে চা শ্রমিকরা নিজেদের ভাল,মন্দ, উচিৎ ,অনুচিৎ যেমন বুঝতে পারেন না, তেমন নি এই দুর্বলতার সুযোগে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে সমস্থ মৌল-মানবিক অধিকার থেকে। এই নির্মমতা আর ভয়াভহতাকে শেখানো হচ্ছে নিয়তি বলে। তাই পরিস্থিতি যতই অসহনীয়ই হোক, যত অবমাননাকরই হোক না কেন তার বিরুদ্ধে কেউ এখন পর্যন্ত টু শব্দটিও করছেন না। যুগ যুগান্তরের এই অপমান অবমাননা তবে কি চলতেই থাকবে? নিয়তির কাছে কি পরাজিত হবে মানুষের স্বপ্ন সাধ?

এই অবস্থা থেকে উত্তোরনের লক্ষে সিলেট শহরের আশপাশের কয়েকটি চা বাগানের ছাত্রদের উদ্যোগে ২৭ এপ্রিল'১৪ সিলেটের শহীদ মিনারে মানববন্ধনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে 'চা বাগান শিক্ষা অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ'। শুরু থেকেই চা বাগানের ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের পরামর্শের ভিত্তিতে আমরা চা বাগানের শিক্ষার সমস্যাকে সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করে ৫ দফা দাবি উথাপন করি। মূলত ২০১৪সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে আমাদের যাত্রা শুরু হলেও তার পেছনেও রয়েছে আরও একটি দীর্ঘ ইতিহাস। চা বাগানের শিক্ষার সমস্যাকে সুনির্দিষ্ট করে তুলে ধরে চা বাগানের ছাত্রদের নেতৃত্বে শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্ঠা আমাদের জানা মতে ইতিপূর্বে হয় নি, যদিও কয়েকজন মানুষ ব্যাক্তিগতভাবে এবং কিছু স্থানীয় সংগঠনও কিছু সাহায্য সহযোগিতা করার চেষ্ঠা করছেন। আমরা মনে করি চা বাগানের শিক্ষার সমস্যা শুধুমাত্র কিছু আবেদন নিবেদন কিংবা কিছু ব্যাক্তির ব্যাক্তিগত সহযোগিতার দ্বারা সমাধান সম্ভব নয়। এই সমস্যার মূলে রয়েছে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা, সমাজ পরিচালনার দৃষ্ঠিভঙ্গি, তাই সংগঠিত আন্দোলন ছাড়া তা থেকে মুক্তিও সম্ভব নয়। এই লক্ষকে সামনে রেখে গত ২বছর ধরে আমরা তিলে তিলে সংগঠিত হবার চেষ্ঠা করছি, নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্ঠা করছি। এই কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে আমাদের পরিধি যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, একই ভাবে নানা ঘাত প্রতিঘাতে আমাদের চিন্তাও খানিকটা সমৃদ্ধ হয়েছে। আমরা এই আন্দোলনকে একটা কার্যকর জায়গায় নিয়ে যেতে চাই, তাই আমারা আমাদের চিন্তাকে সকলের সামনে তুলে ধরতে যাচ্ছি। এই প্রচেষ্ঠায় আমরা সমাজের সকলের মতামত, সহযোগিতা এবং পরামর্শ প্রত্যাশা করছি।

চা বাগানের ইতিহাস

এদেশে চা শিল্প বিস্তারের একটা দীর্ঘ অতীত আছে। খ্রিষ্টপূর্ব সময় থেকে চীন দেশে মূলত চায়ের প্রচলন ছিল। ৮০০ সাল থেকে বিভিন্ন দেশে চায়ের প্রচলন শুরু হলেও ১৬৩৭ সাল থেকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বিশ্বব্যাপী এর বিস্তার ঘটাতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়ায় ভারতবর্ষে ইংরেজরা চায়ের চাষ শুরু করে, যদিও এর পূর্বে ভারতের আসাম প্রদেশে চায়ের অস্তিত্ব ছিল। ১৮৩৪ সালে ভারতের গর্ভনর জেনারেল স্যার উইলিয়াম বেনটিং ভারতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চা চাষের জন্য প্রথম কার্যকরী কমিটি গঠন করেন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন। বিস্তর গবেষণার পর এই 'টি কমিটি' ঘোষনা করে যে আসামের চা চীনা চায়ের চেয়ে অনেক উন্নত মানের। এ ঘটনা এ অঞ্চলে চা শিল্পের জন্যে এক নবদিগন্ত উন্মোচন করে। ১৮৫৪ সালে মালনীছড়া চা বাগানের মাধ্যমেই এ অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে চায়ের চাষ শুরু হয়। চায়ের চাষ ইংরেজরা শুরু করলেও ১৮৮০ সাল থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে দেশীয় উঠতি ধনীক শ্রেনীও চা চাষ শুরু করে । কিন্তু সমস্যা হলো চা বাগান করতে তো প্রচুর শ্রমিক প্রয়োজন, এতো শ্রমিক আসবে কোথা থেকে ? এরই সমাধান খুজঁতে গিয়ে তৈরি হলো মানব সভ্যতার এক নির্মমতম ইতিহাস। আজীবন কাজের শর্তে চুক্তিবদ্ধ করে বিহার,উড়িষ্যা, মাদ্রাজ,উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বাকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলের গরীব চাষীকে চা শ্রমিক হিসাবে সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু কিসের আশায় নিজের আজন্ম পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে এই কৃষকরা আসামের শ্বাপদ সংঙ্কুল জঙ্গলে আসলেন ? ভারতের তৎকালীন আর্থ সামাজিক অবস্থাই এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বাস্তবে ইংরেজ শাসনের ঐ সময়ে বিদেশী পুজিঁর ছত্র ছায়ায় ভারতীয় জাতীয় পুজিঁর বিকাশ ঘটতে থাকে। ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'র ফলে জমি কেনা বেচার পন্যে পরিণত হয় ।ফলে প্রত্যক্ষভাবে কৃষি কাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন একদল শহুরে জমিদার তৈরি হয়,কৃষি উৎপাদন বাজারে বিক্রি করাই যাদের আয়ের অন্যতম উৎস । তাই স্বভাবিক কারনেই জমি মুষ্ঠিমেয় উঠতি ধনীক শ্রেনীর হাতে কুক্ষিগত হয় আর সব হারিয়ে নিঃস্ব হতে থাকে সাধারণ কৃষকরা। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণ কৃষকরা অনেকেই গরীব ও ভূমিহীন হয়ে পড়েন। আর ক্রমাগত নিঃস্ব হওয়া এই মানুষের সামনে তখন

বেনিয়া ব্রিটিশরা প্রচার করলো উন্নত জীবনের গল্প, তাদের বলা হলো আসামের বাগানে 'গাছ হিলায়েগা তো পায়সা মিলেগা'। যে মানুষগুলো প্রতিনিয়ত চোখের সামনে বিনা চিকিৎসায়-অনাহারে প্রিয়জনকে ধুঁকে ধুঁকে নিঃশেষিত হতে দেখে, তাদের কাছে ধূর্ত ইংরেজদের ছলনা তো বিশ্বাস যোগ্য হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। শুধুই কি ছলনা, এর সাথে রাষ্ট্র যন্ত্রের ভয়-ভীতি প্রদর্শন দালালদের দৌরাত্ব তো ছিলই। দালালদের এই দৌরাত্ব কত ভয়াবহ ছিল তার একটি মর্মান্তিক চিত্র অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় শ্রীকান্ত উপন্যাসের ৩য় খন্ডে তুলে ধরেছেন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপ্যাধায়। তাই একথা যেমন ঠিক যে চা শিল্পের বিস্তার গোটা ভারতবর্ষে তথা বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে সাথে একথাও সমান সত্য যে এর সাথে যুক্ত হয়ে আছে চা শ্রমিকদের জীবনের এক নির্মম ইতিহাস। চা শিল্প নিয়ে শুরু থেকে সুশীল সমাজ বলে খ্যাত একদল যত উচ্চকিৎ, চা শ্রমিকদের কথা যেন এদের কন্ঠে ততই ম্রিয়মাণ। সভ্যতার এই নিষ্ঠুর বৈপরিত্য আর কতো কাল চলবে তার উত্তর আজো মেলেনি, কিন্তু ভবিষ্যৎ নিশ্চয় তার সমুচিত জবাব দেবে।

শিক্ষা কি? চা বাগানে শিক্ষার অধিকার কেন মানবিক ?

পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যার চিন্তা করার ক্ষমতা আছে। আদিম অবস্থায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিরুদ্ধ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে গোটা প্রাণীজগৎ যখন বিলুপ্ত হয়েছে কিংবা বশ্যতা স্বীকার করে কোন রকমে টিকে থেকেছে তখন মানুষই ছিল এর একমাত্র ব্যতিক্রম। মানুষ এই প্রাকৃতিক পরিবেশের দাস হয়ে তো থাকে নি, বরং গোটা বস্তুজগতকে জেনে, তার ভেতরের নিয়মকে অবিষ্কার করে, বিরুদ্ধ পরিবেশকে করেছে নিজের বিকাশ উপযোগী । মানব জাতির এই অগ্রগতির পথে সে একদিকে যেমন সৃষ্টি করেছে নানা বস্তুগত উৎপাদন অন্যদিকে জন্ম দিয়েছিল কাব্য-সাহিত্য-শিল্প সুষমা। বস্তুগত উৎপাদন মানুষের জীবনে এনেছে প্রাচুর্য্য আর কাব্য -সাহিত্য মানুষকে করেছে মানবিক। আর এই বিকাশের পথে মানুষ যতটুকু এগিয়েছে, ততই উন্নততর হয়েছে তার সামাজিক চেতনা। পৃথিবীর পথে চলতে চলতে মানুষই তিলে তিলে নির্মাণ করেছে সমাজ-সভ্যতা, জন্ম দিয়েছে উন্নততর চিন্তা-চেতনা। জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে মানুষের এই বিশেষ ধারণাকেই বলা হয় শিক্ষা। এ শিক্ষা মানুষকে বিকশিত করেছে, করেছে মানবিক। এই শিক্ষাকে আরও কার্যকরী, আরও সুনির্দিষ্ট ভাবে মানুষের কাছে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে তৈরি হয়েছে নানা প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন। ফলে একথা স্পষ্ট যে, শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি সামাজিক, তার প্রয়োজনও সামাজিক। তাই শিক্ষা বিহীন অবস্থায় মানুষের অগ্রযাত্রা কোন ভাবেই সম্ভব নয়। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা মানেই হলো মানুষের বিকাশের পথ রুদ্ধ করা, মানুষকে

আধিনতায় ঠেলে দেয়া।

মানুষের অগ্রযাত্রার এই অকুতি ধারণ করে একদিন নবজাগরণের পথিকদের বাণী 'মানুষ জন্মগত ভাবে স্বাধীন' তাবৎ দুনিয়াকে আলোড়িত করলেও সবুজ শ্যামলের পাহাড় ঘেরা চা বাগানে এসে আজও পৌঁছায় নি। এখানে জন্ম যেন জীবনের এক বিপুল অপচয়। যুগ যুগান্তরের অবহেলা-অপমানের বোঁঝা সমগ্র চা জনগোষ্ঠিকে শুধু সভ্যতার আলো থেকেই বঞ্চিত করেনি, নিজেকে একজন মানুষ হিসেবে ভাবার অধিকার থেকেও যেন বঞ্চিত করেছে। আর এই পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ গত দেড়শ বছর থেকে সমগ্র চা জনগোষ্ঠিকে শিক্ষার মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বৃট্রিশরা তাদের অনুগত কেরানী তৈরি করতে চেয়ছিল, পাকিস্তানীরা তাদের প্রায় উপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজনে শিক্ষাকে দূর্মূল্য করেছিল ফলে সে সময় দেশের অন্যান্য অংশের মানুষের মত চা শ্রমিকরাও শিক্ষা অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তা আনেকাটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আজ দেশ যে স্বাধীন, স্বাধীনতার বয়স যে ৪৫ বছর, তবুও চা শ্রমিকরা শিক্ষা অধিকার থেকে বঞ্চিত। একি স্বাধীনতার সুফল না লজ্জা ?

শিক্ষার অধিকার সর্বজনীন ঃ প্রতি বাগানে সরকারি স্কুল চাই!

আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার অধিকার সর্বজনীন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ন্যায় আমাদের সংবিধানেও এর স্বীকৃতি আছে, শুধু তাই নয় মানুষের শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়নে একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলকও করা হয়েছে। কিন্তু ১৫ লক্ষাধিক চা জনগোষ্ঠিকে শিক্ষার ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ঠেলে দেয়া হয়েছে মানবেতর জীবনে। যতটুকু জানা যায় সারা দেশের ১৬৬টি বাগানের মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে মাত্র ৬টিতে (মতান্তরে১০/১২টি), আর মাধ্যমিক স্কুল আছে ৩টিতে। অথচ সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন"। সংবিধানের এ ঘোষণা চা বাগানে আজও কার্যকর হয়নি, শুধু তাই নয় ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ সরকারের 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা' কর্মসূচিও চা বাগানে বাস্তবায়ন করা হয়নি। এদিকে আবার এই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার স্তর ২০১০ সালে প্রণীত 'জাতীয় শিক্ষানীতিতে' ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ঘোষনা করে বলা হয় তা ২০১৮ সালের মধ্যে কার্যকর করা হবে, অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার স্তর ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত। কিন্তু চা বাগানে যেখানে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহনের উপযোগী আয়োজন নেই, শিক্ষক নেই, অবকাঠামো নেই সেখানে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক

শিক্ষা বাস্তবায়ন কিভাবে সম্ভব ? চা বাগানের মানুষের সাথে একি নির্লজ্জ প্রহসন নয় ? সরকারের উপরোক্ত বক্তব্যগুলো তাদের কাছে শুধুই দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কি মনে হতে পারে? সরকার গত কয়েক বছর পূর্বে সারা দেশে() হাজার প্রাথমিক স্কুলকে রেজিস্টার স্কুল করে সরকারের পরিচালনাধীন করে, এই আয়োজনে শ্রীমঙ্গল অঞ্চলের চা বাগানের বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়কে অন্তভূক্ত করার কথা থাকলে ও তা এখন পর্যন্ত কাগুজে ঘোষনা পর্যবসিত হয়ে আছে। বারে বারে রাষ্ট্র কৌশলে চা শ্রমিকদের শিক্ষার অধিকার অস্বীকার করেছে , কিন্তু তারপরও চা-শিল্পের জন্যে স্বীকৃত রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী শ্রমিকের শিক্ষা অধিকার বাস্তবায়নের দায় বাগান কর্তৃপক্ষের। তাই শ্রম আইনের কল্যাণে কর্তৃপক্ষ বাগানে কিছু স্কুল চালায় (১৮৮টি), যা নামে মাত্র। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ স্কুলগুলো এক কক্ষ বিশিষ্ট এবং একজন শিক্ষক প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রদের একসাথে গাদাগাদি করে ক্লাস নেন। আবার ভাষাগত পার্থক্যের কারণে পাঠ্য বিষয় এবং বাগানের বাইরে থেকে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকের সাথে একাত্ম হতে পারে না শিক্ষার্থীরা। এরপর যারাও বা এগিয়ে আসে, চূড়ান্ত অর্থিক অসচ্ছলতার কারণে তারাও বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেন না। আর এই সুযোগে বিভিন্ন এন.জি.ও তাদের জাল বিস্তার করছে, যা অন্যদিক থেকে চা শ্রমিকদের আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেলছে। এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি প্রণীত 'শিক্ষা আইন-২০১৬' এর ৫/৪ নং ধারায় ঘোষনা করা হয় " সকল শিশুর জন্যে বৈষম্যহীন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করিবে; যাহাতে লিঙ্গ,ভাষা,বর্ণ,ধর্ম,নৃ-গোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধীতা অথবা অন্য কোন কারনে শিশুর প্রতি কোন রূপ বৈষম্য সৃষ্ঠি না হয়।" কিন্তু শত বছর থেকে চলে আসা পাহাড় প্রমাণ বৈষম্য শুধুমাত্র এই ঘোষনা দিয়েই কি কমবে ? সরকার কিংবা প্রশাসন যদি সত্যিই এ ব্যাপারে সদিচ্ছা থাকে তবে প্রত্যেক বাগানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও প্রতি তিন বাগানকে কেন্দ্র করে একটি মাধ্যমিক স্কুল নির্মাণ করে চা বাগানে শিক্ষা বিস্তারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এটা শুধু আমাদের মনগড়া ধারণা নয়, বরং রাষ্ট্রের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এগুলো সরকার বা মালিকের তাদের দয়া নয়, বরং চা জনগোষ্ঠির ন্যায্য প্রাপ্য। মাত্র ৮৫ টাকা বেতন দিয়ে কোন ভাবেই রাষ্ট্র ও মালিকের সব দায় শেষ হয়ে যায় না। তাই পিছিয়ে পরা এ জনগোষ্ঠির সামগ্রিক বিকাশের স্বার্থে প্রয়োজন রাষ্ট্র তথা সরকারের বিশেষ মনযোগ। যুগ যুগান্তর থেকে রাষ্ট্র কৌশলে এ কাজগুলো এড়িয়ে যাওয়ার ফলে সমগ্র চা জনগোষ্ঠি এখনও পিছিয়ে আছেন। চা জনগোষ্ঠির এই দুঃসহ পরিস্থিতি কোন একজনের বা কোন গোষ্ঠির কিছু আবেদন নিবেদন কিংবা সামান্য কিছু আর্থিক সহযোগীতা দিয়ে সমাধাণ করা সম্ভব নয়। এখন বাংলাদেশ কিংবা গোটা দুনিয়া ব্যাপী চলছে গণতন্ত্র আর উন্নয়নের জয়গান। এই উন্নয়ন,এই গণতন্ত্র শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা ছাড়া বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

এমনকি এই সত্যকে পাঠ্যপুস্তকে পর্যন্ত স্বীকার করে শেখানো হচ্ছে 'শিক্ষাই জাতীর মেরুদন্ড'। আজ বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল উৎপাদনকারী চা শ্রমিকদের শিক্ষার নূন্যতম অধিকার থেকে বঞ্চিত করে জাতীর মেরুদন্ড সোজা হয়ে দাঁড়াবে কি ? তাই প্রতি বাগানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রতি তিন বাগানকে কেন্দ্র করে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণ শুধু চা শ্রমিকদের শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়ন করবে না, বরং আমাদের রাষ্ট্রও যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তাও প্রমাণিত হবে।

কেন বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরন সরবরাহ ও শিক্ষাবৃত্তি চালু করতে হবে ?

মানুষ তার প্রতিদিনের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে, শিক্ষার একটা নূন্যতম স্তরও যদি সে অর্জন করে তবে সে শুধু নিজেকেই ভাল বুঝতে শেখে এ নয়, সাথে সাথে তার বহুবিধ দক্ষতাও যায় বেড়ে। তাই খুব স্বভাবিক ভাবেই মানুষের মধ্যে শিক্ষা অর্জনের একটা প্রাণান্তকর চেষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। এমনকি একটু ভাল জীবনের আশায় একজন অভিভাবক তার শেষ সহায়টুকু পর্যন্ত উজাড় করে দিয়েও সন্তানকে পড়াশোনা করাতে চান। চা শ্রমিকদের জীবনে শত পশ্চাৎপদতা সত্ত্বেও এ বিষয়টি খানিকটা তারা অনুধাবন করেছেন, ফলে বাধাঁর পাহাড় অতিক্রম করে তাদের মধ্যেও এ প্রচেষ্ঠা লক্ষ করা যায়। কিন্তু এ প্রচেষ্ঠা যে কত কষ্ঠের, কত দূরহ তা সাধারণ ভাবে কল্পনার ও অতীত। চা বাগানের একজন ছাত্র যদি কোনক্রমে প্রাথমিক পর্যায় শেষ করতে ও বা পারে কিন্তু মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণ তার কাছে পাহাড় কাটার মত ব্যাপার। একে তো বাগানে মাধ্যমিক স্কুলই নেই, তার উপর আবার বাগানের ৫/১০ কি.মি. মধ্যে যে স্কুলগুলো আছে তার প্রায় সবগুলো ই বেসরকারি। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ভর্তি ফি, মাসিক বেতন, পরীক্ষা ফি, তো আছেই, এর সাথে বই, খাতা, কলম, স্কুল ইউনিফর্ম, বাধ্যতামূলক কোচিং ফি দিয়ে শিক্ষা জীবন চালিয়ে যাওয়া শুধু কঠিন নয়, প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এরই মধ্যেই অদম্য ইচ্ছা শক্তির উপর ভর করে কিছু ছাত্র পড়াশোনা করে। এদের প্রায় সবাই ছুটির দিনে বা কখনও কখনও স্কুল বাদ দিয়ে সাধ্য অনুযায়ী বাগান বা আশপাশের এলাকায় কাজ করে। আর এই উর্পাজনের পয়সা দিযে চলে শিক্ষা অর্জন। ফলে মাধ্যমিকের কোটা শেষ হবার আগেই শেষ হয়ে যায় তাদের শিক্ষা জীবন, আর যারাও বা তা অতিক্রম করতে পারে তারাও বর্তমানের 'এ প্লাস', 'গোল্ডেন এ প্লাস'এর বাজারে হারিয়ে যায়। এই অবস্থায় বাগান কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ' বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ও শিক্ষাবৃত্তি চালু' যেমন দরকার তেমনি ' চা বাগানের জন্যে বিশেষ কোটা পদ্ধতি' চালু করা দরকার। কিন্তু একথা ঠিক 'বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ও শিক্ষা বৃত্তি চালু' এটা এই

সংকটের চূড়ান্ত সমাধান নয়। রাষ্ট্রীয় আয়োজন নিশ্চিত করা ছাড়া এর সুষ্ঠ সমাধাণ সম্ভব নয় কিন্তু আশু সমাধাণ হিসেবে এটা প্রয়োজনীয়। এখন প্রশ্ন হলো বাগান কর্তৃপক্ষ এগুলো দেবেন কেন ? এটা তাদের দয়া নয় বরং চা জনগোষ্ঠির ন্যায্য পাওনা। কারন চা বাগানের অস্তিত্ব চা শ্রমিকের সাথে অতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে আছে, আর শ্রম আইনের কারণেও বাগানের শিক্ষার দ্বায়িত্ব কর্তৃপক্ষের। এগুলো আমাদের উত্তাপিত কোন নতুন ধারণা কিংবা অযৌক্তিক দাবি নয়। এর যৌক্তিকতা মেলে সম্প্রতি প্রণীত শিক্ষা আইন ২০১৬ এর ৫/৫ ধারায়,যেখানে বরা হয় 'অনগ্রসর এলাকা বা অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যথাযথ যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করিবে।" এমন কি ১৯৯৮ সালের ১৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রনালয় কর্তৃক 'চা বাগান শ্রমিক কল্যাণ তহবিল' নামে জারি করা প্রবিধানে। এই প্রবিধানের ৮নং ধারার (ঙ) উপধারায় পাঠ্যপুস্তক ক্রয় বাবদ বাৎসরিক ৪ হাজার টাকা অনুদান প্রদানের বিধান রাখা হয়েছিল, কিন্তু এ ব্যাপারে কেউ কোন কিছু প্রায় জানেনই না। আবার ২০ জুন'১০ সালে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত ''বাংলাদেশ চা শিল্পের জন্যে কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা: রুপরেখা ২০২১'' এ ৯৬,৭৩৫.৭০ লক্ষ টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে 'চা বাগানের শ্রমিক কল্যাণ' বাবদ ১০২৪১.৮৩ লক্ষ টাকা এবং 'চা বাগান ব্যবস্থাপনা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন' বাবদ ৪৯৯.৮১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। চা বাগানে সরকারের এই দু'টি সিদ্ধান্তই চালু আছে কিন্তু শুধু মাত্র শিক্ষক প্রশিক্ষণে ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ করা ছাড়া শিক্ষাখাতে আর ১টাকাও বরাদ্দ রাখা হয় নি। বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত 'চা বাগানের শ্রমিক কল্যাণ' ও 'মানব সম্পদ' উন্নয়ন কি চা শ্রমিকদের শিক্ষা অধিকার নিশ্চিত করা ছাড়া সম্ভব?

চা বাগানে বিশেষ কোটা পদ্ধতি চাই

যে কোন গণতান্ত্রিক দেশে তার পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠিকে দেশের মূল ধারার সাথে যুক্ত করার জন্যে বিশেষ ধরণের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। আমাদের দেশেও তা সাংবিধানিক ভাবে কার্যকর আছে। আজ দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রশ্নে নিজেদের নিয়োজিত করা ছাড়া শিক্ষা,স্বাস্থ্য,রাষ্ট্র প্রশাসনে অংশগ্রহনসহ যে কোন বিবেচনায় চোখ বন্ধ করে বলে দেয়া যায় বাংলাদেশের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠি হলো চা শ্রমিকরা। আর শিক্ষাক্ষেত্রে চা জনগোষ্ঠি কতটুকু পিছিয়ে আছেন তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। এদিকে বহু লড়াই সংগ্রাম আর আত্মত্যাগের বিনিময়ে (যেখানে চা শ্রমিকদের বীরচিত ভূমিকা ছিল) আর্জিত বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ এর (৪) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "... নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর

অংশের অগ্রগতির জন্যে বিশেষ বিধান প্রনয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না" স্বাধীন দেশের ৪৭ বছর অতিবাহিত হলেও রাষ্ট্র এই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির প্রতি তার অঙ্গিকার রক্ষার্তে আজ পর্যন্ত কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেয় নি। আমরা মনে করি বাংলাদেশের এই বিশাল জনগোষ্ঠিকে দেশের অন্যান্য অংশের মানুষের সাথে সম পর্যায়ে নিয়ে আসতে হলে বিশেষ কোটা পদ্ধতি খুবই জরুরি। এখন অনেকে প্রশ্ন তুলবেন দেশে আরও বিভিন্ন প্রকার 'কোটা ব্যবস্থা' চালু আছে নতুন করে চা শ্রমিকদের জন্যে তা চালু করা অযৌক্তিক আর চা জনগোষ্ঠি তো উপজাতি কোটার অর্ন্তভূক্ত। বাস্তব সমস্যা এখানে নয়, বরং উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্যে যে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া দরকার ছিল সমস্যার মূল সেখানে নিহিত। এদিকে বাগানের বসবাসরত ৪৭টি সম্প্রদায়ের মধ্যে অল্প কিছু মানুষ উপজাতি কোটার অন্তভূক্ত হলেও তা সমগ্র চা জনগোষ্ঠিকে এগিয়ে নিতে সহায়ক নয়। আবার অনেকে এই মত ও ধারণ করেন যে চা শ্রমিকরা যে সব অঞ্চল থেকে এখানে এসেছেন সেই অনুযায়ী তারা উপজাতি নন। তাই সব কিছু বিবেচনা করে দেশের সংবিধান সম্মত উপায়ে 'বিশেষ কোটা পদ্ধতি' চালু করতে কোন আইনী জঠিলতাও নেই। বিষয়টি আবার অন্য ভাবেও দেখা যায় যে, সভ্যতা বিকাশের বিভিন্ন স্তরে গোটা মানব সমাজের অগ্রগতি একসাথে হয় না। সমাজ পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতের ঐতিহাসিক কারনেই এই অসম বিকাশ ঘটে। আবার মানব সমাজের বিকাশের পথে যখন একটা জবরদস্তির সমাজ বা শাসন ব্যবস্থা তৈরি হয় তখনও মানুষের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিকাশের পার্থক্য হয়। কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক। একটা হয় বিকাশের অভ্যন্তরীন নিয়মে আর একটা হয় কৃত্রিম ভাবে চাপিয়ে দিয়ে। তাই সমাজ আছে মানেই মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকবে এই যুক্তির আড়ালে কোন জোর জবরদস্তি কিংবা নিপিড়নকে যুক্তিগ্রাহ্য করা লোক ঠকানোরই নামান্তর। যুগ যুগ ধরে চা শ্রমিকদের সাথে এই প্রতারণাই হয়েছে। তাই আজ 'বিশেষ কোটা' দাবি করা মানে কিছু সুবিধা আদায় নয়, বরং তা মানুষের মর্যাদা নিয়ে দাঁড়ানোরও একটি পদক্ষেপ।

যোগ্যতার নিরিখে বাগানের যুবকদের কাজ চাই

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মূলত ইংরেজ মালিকদের উদ্যোগে চায়ের বাণিজ্যিক চাষ শুরু হয়। এই ইংরেজ মালিকদের অনেকেই একসময় পশ্চিম ভারতের দ্বীপপুঞ্জে এবং তারও পূর্বে এদের একটি অংশ আমেরিকায় দাস ব্যবসা করতেন। ফলে এই মালিকদের দ্বারা পরিচালিত চা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের সাথেও শুরু থেকে এই একই প্রথা ও পদ্ধতি চালু করা হয়। 'গিরমিট প্রথা' কিংবা প্রতিদিন সকালে 'গুনতি' (শ্রমিকদের গুনে গুনে কাজে নামানো) এরই স্বাক্ষবহন করে। এর বিষময়

প্রভাব সেই সুদূর থেকে আজ আবদি চা শ্রমিকদের গোটা সমাজ সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এই বিষয়টি বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত 'উন্নয়নের পথ নকশাঃ বাংলাদেশের চা শিল্প' পুস্তিকার ২১নং পৃষ্ঠায় বলা হয় "…. এদেশে…এরা একধরণের ক্রীতদাসের ন্যায় জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। ফলে স্থানীয় কোন মানুষের সাথে এমনকি চা বাগানের বাইরের কারো সাথে কোন যোগাযোগ গড়ে উঠেনি। শিক্ষার কোন সুযোগও তাদের দেয়া হয় নি। একধরণের মানবেতর জীবন যাপন এবং শিক্ষার অভাবে চা বাগানে কাজ করা ভিন্ন অন্য কোন পেশায় নিয়োজিত হবার সুযোগও তারা পায় নি। বংশ পরম্পরায় চা শ্রমিকগণ একই পেশায় নিয়োজিত থাকতে বাধ্য হয়েছে।" চা বোর্ডের এই সত্য ভাষনের বিপরীতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের নজীর এখনও চোখে পড়ে না বরং তার একটা উল্টো চিত্রই চোখে পরে।গত দেড়শ বছর ধরে চা বাগানে এমন এক পরিস্তিতি তৈরি হয়েছে যে যত যোগ্যতা, যত দক্ষতাই থাক শ্রমিক সন্তাস মানেই সে অবধারিত ভাবে শ্রমিকই হবে। এমন কি বাগানের একটি ছোট্ট পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে শত যোগ্যতা থাকলেও শ্রমিক সন্তানকে নিয়োগ দেয়া হয় না। শুধু তাই নয় বাগানের বিভিন্ন পদে কর্মরতদের সাথে শ্রমিকদের একটা সাংস্কৃতিক মনস্তাত্বিক বিরোধ তৈরি করা হয়েছে। বাগানের কর্মকর্তা কর্মচারী সকলেই বাবু আর শ্রমিকরা অস্পৃর্শ কুলি। ফলে চা বাগানের কর্মক্ষম শত শত যুবক চরম হতাসায় দিনাতিপাত করছে। এই হতাসাগ্রস্ত যুব সমাজ স্বীকার হচ্ছেন অপসংস্কৃতির। এই পরিস্থিতি চা শ্রমিক তো বটেই চা শিল্পের জন্যেও মারাত্বক হুমকিস্বরূপ। কারণ চা শিল্পের বৈশিষ্ট্যই হলো তা শ্রমঘন শিল্প। চা শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়ন ব্যাতিরেকে এই শিল্পের অগ্রগতি কোন ভাবেই সম্ভব নয়। চা বাগানে চাইলেই বাইরে থেকে শ্রমিক নিয়োগ করে যেমন কাজ চালানো যায় না, একই ভাবে শুধু যন্ত্র নির্ভর করেও এর উৎপাদন বাড়ানোরও উপায় নেই। তাই এই বিশাল কর্মক্ষম যুব শক্তিকে সম্পাদে পরিণত করতে যোগ্যতার নিরিখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন পদে চাকুরি দিতে হবে। এখন এই 'অগ্রাধিকার' বিষয়টিতে অনেকেই আপত্তি তুলবেন, এক্ষেত্রে একটা ঐতিহ-াসিক অধ্যায়কে সকলের মনে রাখতে হবে। এই সুন্দর চা বাগান, আর লাভ জনক চা শিল্পকে গত দেড়শ বছর ধরে তিলে তিলে নির্মাণ করেছেন চা শ্রমিকরা, তাই অগ্রধিক-ারও তাদেরই বেশি। অনেক প্রতিষ্ঠানে পোষ্য কোটা যেমন থাকে এ অনেকটা তেমনি। এতে একদিকে যেমন চা বাগানের যুবকদের মধ্যে একটা প্রাণের সঞ্চার করবে অন্যদিকে চা বাগানের উৎপাদনও যাবে বহুগুন বেড়ে। আজ আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় এ রকম বহু বিষয় এখন পরিলক্ষিত হয়। চা শিল্পের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যদি আধুনিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বদলে বৃট্রিশদের সেই গতানুগতিক পদ্ধতিই বহাল রাখেন তবে ভবিষ্যতে তা গোটা চা শিল্পের মূলে কুঠারাঘাত করবে।

চা শ্রমিকদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত কর

বর্তমান সময়ে চা শ্রমিকদের সবচেয়ে জনপ্রিয় দাবিটির নাম ভূমি অধিকার। গত দেড় শতাধিক বছর ধরে কী অসীম আত্মত্যাগ আর কী অপূর্ব মমতায় চা শ্রমিকরা গড়ে তুলেছেন আজকের চা শিল্প তা বাইরে থেকে বুঝা অনেকটা কষ্ঠ কল্পনা। সুদূর অতীতে একদিন একটু ভাল জীবনের আশায়, সন্তান সন্ততী নিয়ে একটু সুখে থাকার আসায় এখানে এসেছিলেন চা শ্রমিকরা। ব্রিটিশদের সেই ছলনা, মিথ্যা আশ্বাস বুঝতে বেশি দিন লাগে নি, কিন্তু তখন আর কিছুই করার ছিল না। তাই বাধ্য হয়েই বাগানে থাকতে হয়েছে। তখনকার আসামের গহীন অরণ্য, আর পাহাড় ঘেরা বিস্তৃর্ণ প্রান্তরকে চা শিল্পে রূপ দিতে গিয়ে সেদিন মেনে নিতে হয় প্রায় দাসোচিত জীবন। তারপরও বুকের কোন এক নিভৃত কোণে জেগে ছিল সেই একটু ভাল থাকার স্বপ্ন। চা শ্রমিকদের এই দীর্ঘ পথচলা মূলত বঞ্চনা আর অপমানের ইতিহাস, ধূকেঁ ধূকেঁ ক্রমে নিঃশেষ হবার ইতিহাস, কিন্তু এর মধ্যেই গড়ে উঠেছে তাদের নিজেদের আপন ভূবন। বাগানের ঘেরুয়া পথ, জরাজীর্ণ ঘর আর চা শ্রমিকদের জীবনের মত সমস্থ গ্লানি বহন করে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা টিলাগুলোর সাথে গড়ে উঠেছে তাদের নাড়ীর সম্পর্ক। ব্রিটিশ গেল, পাকিস্তান বিদায় নিল বারবার চা শ্রমিকরা আশায় বুক বাঁধলেন কিন্তু হতাস হতে হলো বারে বারে। স্বাধীন দেশের ৪৫ বছর অতিক্রান্ত কিন্তু আজো চার পুরুষের ভিটেয় চা শ্রমিকদের কোন আইনি অধিকার নেই। মালিক চাইলেই বাগান থেকে যে কোন শ্রমিককে তুলে দিতে পারে, আর একবার যদি কেউ চা বাগান থেকে উচ্ছেদ হন তবে এ জগতে মাথা গোজার টাইটুকু পর্যন্ত নেই। আজ চা বাগানে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো তার কোন স্থায়ী ঠিকানা নেই, অনিশ্চিত তার ভবিষ্যৎ। আর এই ভূমির উপর অধিকার না থাকায় কখন ও স্টেডিয়ামের নামে, কখনও ইপিজেড এর নামে অবাধে চলছে চা শ্রমিকদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ। চা শ্রমিকদের সর্বস্ব কেড়ে নিতে ইতিমধ্যে শুরু হতে চলেছে আরেক বাহারি প্রকল্প যার নাম 'টি-ট্যুরিজম', ইতিমধ্যে শ্রীমঙ্গলে গড়ে উঠা 'হোটেল গ্যান্ড সুলতান' এই প্রক্রিয়ারই শুরু।

বর্তমান বাংলাদেশে চা বাগানের জন্যে বরাদ্দকৃত ১,১৬১৭২ হেক্টর জমির মধ্যে ৬৫২১৭ হেক্টর জমিতে চা চাষ হয় আর বাকি জমি ক্ষেতল্যান্ড,কারখারনা, শ্রমিক বস্তি, পতিত জমি ইত্যাদি চা বাগানের আনুসঙ্গিক ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহত হয়ে আসছে (উন্নয়নের পথ নকশাঃ রূপরেখা ২০২১) এই পুরো জমিটাই সরকারি জমি। শুধুমাত্র চা বাগান করার শর্তে দীর্ঘ মেয়াদী লীজ(অর্থাৎ ৩০-৯৯ বছর পর্যন্ত) এর মাধ্যমে তা মালিকদের বরাদ্দ করা হয়। আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সাধারণত

৬০বিঘার উর্ধ্বে জমি রাখতে না পারলেও চা বাগানের জন্যে তা শিথিল করা হয়েছে, কিন্তু এ সীমা সর্বোচ্ছ কতটুকু তাও নির্ধারণ করা হয় নি। এদিকে কৃষি ও অকৃষি জমির জন্যে যে উন্নয়ন কর ধার্য্য করা হয়েছে তাও চা বাগানের জমির জন্যে কার্যকর নয়, বরং চা বাগানের জন্যে তা স্বতন্ত্র, প্রতি শতাংশে ১.১০টাকা হারে। আবার কোন বরাদ্দকৃত জমির আল্প কিছু অংশে যদি শিল্প বা আবাসিক কাজে ব্যবহত হয় তবে সম্পূর্ণ জমিটাকেই শিল্প-বানিজ্যীক কাজে ব্যবহত জমি হিসাবে ধরে উন্নয়ন কর নির্ধারিত হবে, কিন্তু চা বাগানের বরাদ্দকৃত জমি তারও অন্তর্ভূক্ত নয়। (উপরে প্রাপ্ত তথ্যগুরো বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানূয়াল থেকে প্রাপ্ত) তাই এটা খুব স্বাভাবিক যে ভূমি সংক্রান্ত প্রশ্নে সারা দেশের প্রচলিত ধারণা আর চা বাগানের ধারণা এক নয়। ফলে সংগত কারণেই চা শ্রমিকদের বসত ভিটা, কৃষি জমি কোন কিছুই না থাকলেও দেশের প্রচলিত আইনে সরাসরি তারা ভূমিহীন নন। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানূয়ালের ৫৩ ধারায় ভূমিহীনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে এভাবে '(ক) যে পরিবারের বসতবাটি এবং কৃষি জমি কিছুই নাই, কিন্তু পরিবারটি কৃষি নির্ভর/(খ) যে পরিবারের বসতবাটি আছে কিন্তু কৃষি জমি নাই অথচ কৃষি নির্ভর/(গ) যে পরিবারের বসতবাটি এবং কৃষি জমি উভয়ই আছে কিন্তু উহার মোট পরিমান ০.৫০ একরেরকম অথচ কৃষি নির্ভর' এবং এখানে কৃষি নির্ভর বলতে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে অন্যের জমিতে শ্রমিক হিসেবে বা বর্গা চাষি হিসেবে কাজ করে। এই সংজ্ঞা হিসেবে চা শ্রমিকরা যে ভূমিহীন নয়, তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে কিন্তু ভূমি ম্যানূয়েলের ৮ম অধ্যায়ের ১৬০তম ধারাটি দেখি সেখানে বলা হচ্ছে " চা বাগান, রাবার বাগান...কতৃর্ক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের ক্ষেত্রে কৃষি জমির এই উর্ধ্বসীমা প্রযোজ্য হইবে ন।..." এখানে স্পষ্টতই চা বাগানের জমিকে 'কৃষি জমি' বলা হচ্ছে। চা বাগানের জমি যদি 'কৃষি জমি' হয় তবে চা শ্রমিকরাও ভূমিহীন। বাংলাদেশ সরকার সরাসরি চা শ্রমিকদের ভূমিহীন স্বীকার না করলেও শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করতে পারে নি। আবার স্বীকার -অস্বীকারের ছেয়ে বড় প্রশ্ন একটা আইন প্রণীত হবে কাদের জন্যে, কোন প্রয়োজনে? মানুষের জন্যে তো, চা শ্রমিকদের সার্বিক অগ্রগতির প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় ভূমি আইনে সামান্য পরিবর্তন তো আসতেই পারে। যেমন করে ১৯৭০ সালে সরকারের 'গুচ্ছগ্রাম সৃজন' বিষয়টি এসেছে, তাই চা শ্রমিকদের ভূমিহীন হিসেবে গন্য করে খাস জমি বরাদ্দ করা যেতে পারে। কারন সরকার ঘোষণা করছে "...খাস জমি চিহ্নিত করিয়া ভূমিহীন ও প্রায় ভূমিহীন চাসী পরিবারের মধ্যে বসতবাড়ী নির্মানের জন্যে কাস জমি বিতরণ এবং বাস্তুহারা পরিবার সমূহের মধ্যে বসতবাড়ী নির্মাণের জন্য খাস অকৃষি জমি বণ্ঠণ 'জাতীয় ভূমি সংস্কার' কার্যক্রমের প্রাথমিক স্তর। (ঐ ধারা ৪১) এক্ষেত্রে চা বাগানের জন্যে বরাদ্দকৃত জমির যে অংশ সরাসরি চা চাষে লাগে না তা চা শ্রমিকদের বরাদ্দ করা যেতে পারে, উল্লেখ্য

এই জমিই চা বাগানের শ্রমিকদের বস্তি এবং ক্ষেতল্যান্ড হিসেবে ব্যবহত হচ্ছে। এই বরাদ্দের ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় নজরে রাখতে হবে যে, চা বাগানের মালিকানা সরকারি ও বেসরকারি দু'ধরণেরই আছে। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে খুব সহজে সরকারি বাগানের জমি চা শ্রমিকদের নামে বরাদ্দ করতে পারেন। আবার প্রায় প্রতিটি বাগানেই বরাদ্দকৃত জমির একটি বড় অংশ অব্যবহার্য্য আছে, তা সরকার পুনঃগ্রহণ করে চা শ্রমিকদের বরাদ্দ করতে পারে শুধু তাই নয় এই মালিকদের অনেকেই লীজের শর্ত ভঙ্গ করে চা বাগানে অন্যান্য নানা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এদিকে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে 'ধফাবৎংব ঢ়ড়ংংবংংরড়হ ' বা দখলী স্বত্ব বলে একটি আইন আছে, অর্থাৎ ১২ বছরের অধিককাল কেউ যদি কোন জায়গায় অবস্থান করে তবে সেই জায়গার উপর তার একটা মালিকানা তৈরি হয়। আর চা শ্রমিকরা তো আছেন দেড়শতাধিক বছর থেকে। তাই ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে চা শ্রমিকদের জীবন মানের একটা বড় ধরণের পরির্বতন ঘঠতে পারে, আর এটা গোটা চা শিল্পের জন্যে হবে ইতিবাচক পদক্ষেপ। তাই চা শ্রমিকদের ভূমি অধিকারের দাবি শুধু যৌক্তিকই নয়, এর একটা ঐতিহাসিক ন্যায্যতাও আছে।

চা বাগানের শিক্ষাখাতে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ চাই

বাংলাদেশ সরকার চা বাগানের উৎপাদন সক্ষমতা ২০২১ সালের মধ্যে ৬০ মিলিয়ন কে.জি থেকে ১০০ মিলিয়ন কজিতে উন্নীত করতে চান। এ নিয়ে বিস্তর আলাপ আলোচনাও করছেন। কিন্তু চা বাগানের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের কারনেই এই লক্ষমাত্রা বাস্তবায়ন করতে হলে চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন ব্যাতিরেকে তা করা সম্ভব নয়। বিষয়টি খানিকটা ২৩ জুন ২০১৪ সালে বাংলাদেশ চা বোর্ডের সচিব মোহাম্মদ মাঈনুদ্দীন স্বাক্ষরিত ৪ পৃষ্ঠার ' ৫ (পাঁচ) বৎসরের সাফল্যের প্রতিবেদনে' স্বীকার করে নেয়া হয়। কিন্তু কোন এক অজনা কারণে কিংবা ইচ্ছাকৃত ভাবেই সমস্যার মূলে যাচ্ছেন না। চা বাগানের মানব সম্পদ উন্নয়ন কিংবা শ্রমিক কল্যাণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শিক্ষা অথচ তা বারে বারে উপেক্ষিত হচ্ছে। এদিকে শিক্ষা যে মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় বহুগুন একথা আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য। ষাটের দশকে সোভিয়েত শিক্ষাবিদ সে.জি স্ট্রুমালিন এক গবেষনায় দেখান যে, মাত্র এক বছরের শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত সাধারণ স্বাক্ষরতা শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে ৩০% বৃদ্ধি করে, অপরদিকে উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্তদের উৎপাদন ক্ষমতা ৩০০% বেশি। ফলে একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, উচ্চ শিক্ষিত মানুষ মানেই উচ্চ ক্ষমতা-দক্ষতা সম্পন্ন মানুষ। আমাদের দেশের কর্তাব্যক্তিরা চা বাগানে উৎপাদন বাড়াতে চান, অর্থনৈতিক উন্নতি চান কিন্তু শিক্ষায় বরাদ্দ দিতে চান না, এ বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কি? এদিকে

আরোও হাস্যকর কান্ড করেছেন অর্থমন্ত্রী। সম্প্রতি সংসদে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে ১৫লক্ষ চা শ্রমিকদের কল্যানে তিনি ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেছেন!

এদশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রশ্ন ছাড়াও প্রতিটি রাজনৈতিক সংগ্রামেও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বৃট্রিশ বিরোধী আন্দোলন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে চা শ্রমিকরা বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছেন, বারে বারে ঝঙ্কিত হয়েছে তাদের ধনুকের ফলা, বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত হয়েছে সবুজ শ্যামলের বিস্তৃর্ণ প্রান্তর। তাই এদেশের একজন স্বাধীন মানুষ হিসেবে দাঁড়াবার সকল নৈতিক অধিকার যে কোন বিবেচনায় চা শ্রমিকরা অর্জন করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্র বা সরকার গত ৪৫ বছর ধরে এই সত্যকে পায়ে মাড়িয়ে চা শ্রমিকদের জীবনে নামিয়ে এনেছেন এক দুঃর্বিসহ পরিস্থিতি। তাই আমরা মনে করি চা শ্রমিকদের সামগ্রিক অগ্রগতির জন্যে শিক্ষা অধিকার বাস্তবায়নের বিকল্প নেই, আর এ জন্যে জাতীয় বাজেটে চা বাগানের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

আমাদের আবেদন

গত দেড়'শ বছরে অনেক কিছু পাল্টেলেও, চা জনগোষ্ঠির এই দাসোচিত জীবন আজও পাল্টায়নি। প্রতিনিয়ত অপমান অবহেলায় রেখে রেখে বেঁচে থাকার আনন্দ, মানুষ হয়ে জন্মানোর মর্যাদা আজ ভুলিয়ে দেয়া হচ্ছে। মৌল মানবিক সব ধরণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে সমাজ সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে। আর এ অন্যায়কে শেখানো হচ্ছে ভাগ্য বলে । বাগানের এ চিত্রটি প্রধান হলেও তার ভিন্ন চিত্রও কিছু আছে। গত দেড়'শ বছরে চা শ্রমিকরা বহু বীরোচিত লড়াইয়ের জন্ম দিয়েছেন, তারই সাক্ষ্য বহন করছে ১৯২১ সালের বৃট্রিশ বিরোধী ঐতিহাসিক 'মুল্লুকে চল' আন্দোলন। শত শত চা শ্রমিক জীবন দিয়েছেন ঊনসত্তরের গণঅভূথ্যানে, ৭১'র মহান মুক্তিযুদ্ধে। শুধু তাই নয় বিভিন্ন সময় নিজেদের নানা দাবিতে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ও রচনা করেছিলেন চা শ্রমিকরা। কিন্তু এ সত্ত্বেও শুধুমাত্র শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবে তা চা বাগানের গন্ডি থেকে বের হয়ে চা শ্রমিকদের মুক্তির পথ দেখাতে পারে নি। এই লড়াই সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা 'চা বাগান শিক্ষা অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ' গত ২বছর ধরে ৫ দফা দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলার চেষ্ঠা করছি। এরই মধ্যে মানববন্ধন, মিছিল সমাবেশ, স্বাক্ষর সংগ্রহ করে জেলা প্রশাসক বরাবরে স্মারকলিপি পেশ, এবং বাজেটে বিশেষ বরাদ্দের দাবিতে চা বাগান অধ্যুষিত জেলাগুলোতে অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেছি। সমাজের সব অংশের মানুষের সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে আমরা এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে

চাই। সকলের সমর্থন, সহযোগিতা, পরামর্শ এবং অংশগ্রহণ আমাদের পথ দেখাবে, সাহস যোগাবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা নিম্নোক্ত ৫ দফা দাবিতে ধারাবাহিক আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই।

দাবিসমূহ

১. প্রত্যেক চা বাগানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রতি তিন বাগানকে কেন্দ্র করে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণ কর।

২. উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বাগান কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে শিক্ষাবৃত্তি চালু এবং সকল প্রকার শিক্ষা উপকরণ বিনামূল্যে সরবরাহ করা।

৩. চা বাগানের ছাত্রদের জন্যে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে 'বিশেষ কোটা' চালু কর।

৪. চা বাগানের কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চা বাগানের শিক্ষিত যুবকদের চাকুরি দাও।

৫. চা শ্রমিকদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত কর।

চা বাগানে ধারাবাহিক আন্দোলনের খণ্ডচিত্র